একাকিত্বের বর্ণমালা : বাণী রায়ের গল্প

সুদক্ষিণা ঘোষ

১

'শ্রীলতা আর শম্পা' নাকি 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', কোনটা যে আগে পড়েছিলাম, আজ আর মনে পড়ে না ঠিক, তবে এ-কথাটা ঠিকই মনে পড়ে যে, এই দুটো উপন্যাসের কোনো একটিতেই বাণী রায় নামে কোনো লেখকের নাম দেখেছিলাম প্রথম, আর সেই উপন্যাসের পাতার পরে পাতা উল্টে যেতে যেতে চমকে উঠে ভেবেছিলাম, এমন এক সাহসিনী কলমও লুকিয়ে ছিল তবে বাংলা সাহিত্যের ধুলোমাখা কোনো হারানো পাতায়, কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে ঝরে-পড়া নারীদেহের অঙ্গে অঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদের মতো রূপ নিয়ে, শরীরী সচেতনতার দুঃসাহসিক মাত্রা নিয়ে, শরীরী বোধের তুমুল প্রকাশসামর্থ্য নিয়ে, স্রষ্টার বহুপঠনের গভীর তাৎপর্য নিয়েও।

গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি' পড়েছিলাম তার অনেকদিন আগেই, একবার নয়, পড়েছি অনেকবারই, আর যতবারই পড়েছি, কেমন বিভোর এক ভালোলাগায় ভরে গেছে মন, হারিয়ে-যাওয়া কোন্ এক স্নিগ্ধ জগতের মায়া তার কথা-রূপ-গন্ধ নিয়ে বারে বারে ছুঁয়ে গেছে মন; বাণী রায়ের 'শ্রীলতা আর শম্পা' পড়তে পড়তেও যে মনে পড়ে গিয়েছিল গিরিবালা দেবীর কথাই, তার কারণ হয়তো, তখনই জেনেছিলাম, বাণী রায় গিরিবালা দেবীরই আত্মজা, রায়-পরিবারের পরম্পরাকে আখ্যানে বাঁধবার এই একই পরিকল্পনা ছিল লেখিকা-মায়ের মতো লেখিকা-কন্যারও, তাঁর 'রায়বাড়ি'র বয়ানে নতুন কালকে আঁকতে চেয়েছিলেন বাণী রায়, মায়ের সমৃদ্ধির কাল পেরিয়ে লিখতে চেয়েছিলেন ভাঙনকালের ইতিকথা, 'শ্রীলতা আর শম্পা' তাঁর সেই পরিকল্পিত চতুর্মুখ উপন্যাসেরই প্রথম দুই মুখ, 'সকাল সন্ধ্যা রাত্রি' নামে সম্পূর্ণ-হয়ে-ওঠা উপন্যাসটির আখ্যানেও ধরা আছে তারই আদল, প্রাচুর্যময় অতীতের বিপ্রতীপে দারিদ্র্যদগ্ধ আভিজাত্যের গর্বে ভরা বর্তমানের দ্বন্দ্বের বিন্যাস। ততদিনে বাণী রায়ের লেখা খুঁজে খুঁজে পড়তে পড়তে এটাও জানা হয়ে গিয়েছিল যে, প্রকাশিত লেখার চেয়ে অগ্রন্থিত লেখার সংখ্যাই অনেক বেশি তাঁর, আর কেন যে হলো

এমনটা, তার অন্তত একটা কারণ অনুমান করতেও খুব দেরি হয়নি, যখন জানলাম, ***শনিবারের চিঠি*** পত্রিকায় 'প্রেম' নামে বাণী রায়ের প্রথম উপন্যাসটির প্রকাশমুহূর্তেই সমকালের সমালোচনা আর ভ্রূকুটি কী পরিমাণে সইতে হয়েছিল তাঁকে!

১৯৪২ সাল তখন। আজকের দিনের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেকালের দিকে ফিরে চাইলে আজ বুঝতে পারি, ভাষার প্রত্যক্ষতায়, ভঙ্গির স্পষ্টতায় কী অচেনা এক নারীজগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বাণী রায়ের কলমে। আর স্বকালের অনভ্যস্ত পাঠকমনের পক্ষে কতখানি বিস্ফোরক ছিল নারীর নিজস্ব জগতের, তার অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট সে-সব ছবি; পুরানো সে-ইতিহাসের পাতা উল্টোলে তাই আজ আর বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিশ শতকের চারের দশকে কোনো পত্রিকায় তাঁর উপন্যাসের একটি অংশ প্রকাশিত হওয়ামাত্র কেন এমন তোলপাড় উঠেছিল সেদিনের সাহিত্যসমাজে, কেন এতটাই ছিল সে-আলোড়নের তীব্রতার মাত্রা যে, মোহিতলাল মজুমদারের নির্দেশে পত্রিকার পাতায় উপন্যাসটির পরবর্তী অংশের প্রকাশ বন্ধই করে দিয়েছিলেন সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। পরের বছর, ১৯৪৩ সালেই (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) অবশ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছিল বাণী রায়ের ওই উপন্যাস, অসংশোধিতভাবেই।

বাণী রায়ের লেখা খুঁজতে খুঁজতে ততদিনে এ-ও জেনে গেছি যে, বাণী রায় নামের ব্যতিক্রমী স্বাক্ষর প্রধানত ছোটোগল্প-উপন্যাসের পাতাতেই চোখে পড়ে বটে সন্ধানী পাঠকের, কিন্তু কাব্যগ্রন্থের হাত ধরেই লেখালেখি শুরু হয়েছিল তাঁর। এ-ও চোখে পড়তে দেরি হয়নি যে, তাঁর অনেক ছোটগল্পের শিরোনামের মতোই প্রথম এই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণেও হয়তো উঁকি দিয়ে যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহুপঠনে ঋদ্ধ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকাটিরই মনন; একথাটা বিশেষ করে মনে হয় আজকের পাঠকের, যখন দেখি বাণী রায়ের এই কবিতার বইটির নাম 'জুপিটার', কিংবা দেখি কবিতার নাম 'পীনেলোপি', 'জুপিটার', 'প্রেতপুরী', 'চরম বিচারের দিন' বা 'Et tu Brute', আর কবিতা জুড়ে ছড়ানো হেরা, জেউস, সেমেলি, লেডা, অডিসিউস, অণ্ড্রমাকী, সিবিল, সাফো, সালোমে প্রভৃতি অজস্র বৈদেশিক চরিত্র; অথবা কবিতায় পড়ি,

অস্তমিত চন্দ্রালোকে অন্ধ পীনেলোপী
চেয়ে দেখ প্রিয় ভ্রমে দূর ফিকিয়ায়,
নোসিকার মুক্তকেশ বাতাসে উড়ায়,
সুনীল নয়নে তার সমুদ্র-ইঙ্গিত।

কই শুভ্র পারাবত? ছিন্নপক্ষ হায়!
কি সূতায় অঙ্গবাস করিছ সীবন;
নিজের বুনেছ জাল স্বর্ণসূচীক্ষেপে?

কে নেবে বারতা বয়ে দূর ফিকিয়ায়?
আন্ড্রোমাকী অভিশাপ রজত-নখরে
ফেলিল কি অশ্রুবিন্দু কারুশিল্প পরে!

তখন বাঙালি পাঠককেও কি কবিতার পাতা থেকে একবার মন ফেরাতে হয় না ইউলিসিসের গল্পে, ট্রয়-ধ্বংসের আখ্যানে?

এসব কথাও তো ততদিনে জানা হয়েই গেছে যে, দীর্ঘায়ু জীবনে খুব কম ছোটগল্প আর উপন্যাস রচনা করেননি বাণী রায়; দুই মলাটের পরিসরে ধরা আছে তাঁর কিছু গ্রন্থিত গল্প আর অন্তত শতাধিক অগ্রন্থিত ছোটোগল্প তাঁর ছড়িয়ে আছে চেনা-অচেনা-আধো চেনা নানান পত্রিকার পাতায়, সে-সবের পাশাপাশি 'প্রেম' 'শ্রীলতা আর শম্পা' 'আরও কথা বলো' 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' বা 'তনিমা জাতক' এর মতো উপন্যাসও তো খুব কম লেখেননি তিনি!

আর একটা বই পড়ে ফেলে ততদিনে বাণী রায়ের আর একরকম একটা পরিচয় ধরা দিতে শুরু করেছে পাঠকমনে, বইটির নাম 'হাসিকান্নার দিন', কাহিনী তার সামান্যই, আরতি চন্দ্রা মঞ্জরী নন্দিনী, প্রধানত এই চারজন আর তাদের ঘিরে একটি মেয়ে-স্কুলের নানা ক্লাসের, নানা স্তরের মেয়েদের নানা সুখঃদুখের কাহিনী ধরা আছে বইটিতে, কিন্তু কাহিনী নয়, পাঠক হিসেবে সেদিন আকর্ষণ করেছিল যেটা, তা হলো এ-বইখানি লেখবার কারণ, ভূমিকায় লিখেছিলেন বাণী রায়, "যে মেয়ে রূপকথা শেষ করেছে, অথচ বড়দের বই পড়বার বয়স পায়নি, সে সব মেয়ের জন্য তো কই বিশেষ করে কোনো বই লেখা হচ্ছে না। যে বই শুধু তাদেরি নিজস্ব সাহিত্য।

......যদি বা ছেলেরা পড়ার যোগ্য কোনো বই পায়, মেয়েরা কখনোই তা পায় না। ছেলেদের জীবন ও তাদের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত বইগুলোই বাধ্য হয়ে মেয়েদের পড়ে যেতে হয়। ......

.... তাদের একটা সমগ্র জীবন আছে, উদ্দেশ্য আছে, আশা আছে। সে-জীবন ছেলেদের জীবন থেকে পৃথক। সে-জীবনের প্রতিফলন আজ সাহিত্যে আসুক। জগতের অন্য দেশের মতো এদেশেও ছোট মেয়েদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হোক।" নিজে যিনি পড়েছিলেন শ্রীমতী অলকেটের Little Women-এর মতো কোনো বই, আর মাতৃভাষার দিকে চেয়ে অভাব বোধ করেছিলেন এমন লেখার, যাতে কিশোরীরা খুঁজে পাবে নিজের জগৎ, সেই বাণী রায়ের কলমে গড়া এই বিশেষভাবে 'কিশোরীপাঠ্য' আখ্যান পড়তে পড়তে তখন খুঁজতে শুরু করেছিলাম তাঁর সম্পাদিত মেয়েদের লেখালেখির আর একটি বই, তাঁর আগ্রহের আর একটি অভিজ্ঞান— 'লেখিকামন' যা প্রকাশ পেয়েছিল ১৩৭০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে।

কিন্তু, বিখ্যাত সাহিত্যিক মাতার লেখক কন্যা, কিংবা স্বকীয় প্রচুর সৃষ্টি, রচনা-সম্পাদনার জগতের আকর্ষণীয় বিস্তার এবং ঈর্ষণীয় পড়াশুনোর পরিধি— এ-ও কি

বাণী রায়ের সবটুকু পরিচয়? আজকের পাঠকপ্রজন্ম কি জানে, উপন্যাসে বা ছোটোগল্পে মেয়েদের নিজস্ব জগৎটিকে কীভাবে আলোকিত করেছিলেন তিনি, কী বর্ণবিভায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের প্রেমের জগৎ, কী শিল্পিত নৈপুণ্যে ঘটিয়েছিলেন নারীর শরীরী আবেগের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ, তাঁর কলমে বর্ণময় হয়ে উঠে কীভাবে স্বাতন্ত্র্যের নতুন মাত্রা পেয়েছিল মেয়েদের লেখালেখির জগৎ?

২

খুব বর্ণময় বাণী রায়ের লেখালেখির জগৎ, খুব রূপসী বাণী রায়ের নায়িকারা, খুব বিদুষী তারা অনেকেই, খুব নিঃসঙ্গও সকলেই মনের গভীর নির্জনতায়।

কেবল রূপসী নয়, বাণী রায়ের নায়িকারা, দেহের অপ্রমেয় সৌন্দর্য আর সে-সৌন্দর্যের মাদকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনও। রূপ, আত্মসচেতনতা আর নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতা বাণী রায়ের অনেক নায়িকারই স্বভাবের অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য। এই স্বভাবই হয়তো শেষ পর্যন্ত জনারণ্যে এভাবে একা করে দেয় তাদের, একলা পথে চলা রমণীয় করে তোলার জন্য ফিরে চাইতে হয় তাদের অতীত স্মৃতির দিকে, দাঁড়াতে হয় ফেলে-আসা সৌন্দর্যঘন মুহূর্তগুলির মুখোমুখি। বাণী রায়ের গল্পস্বভাবের এই সব ক'টি লক্ষণের স্বাদ ধরা আছে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'নার্সিসাস'-এ, অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে স্রষ্টার বহুপঠনের সাক্ষ্যও।

অধরেতে যেন প্রবালের বন,
নয়নে ইন্দ্রনীল,
হাতির দাঁতের ফলকেতে তনু,
অলক কৃষ্ণচিল,
ললাটের বামে তিল।
আরও কাছে হে প্রেমিক, টানো আরো কাছে,
বাজুক রক্তের গান ধমনীর মাঝে।
রূপ লাগি আঁখি কার ঝুরে নিশিদিন?
কার দুই চোখে ভাসে সে রূপের ছবি?
স্বপ্ন দেখি তার আজও অন্য বাহুপাশে,
মনে হয় মন্ত্রতন্ত্র মিথ্যা কথা সবি।

'দ্বিচারিণী' নামে এক কবিতায় এই পংক্তিগুলি লিখেছিলেন বাণী রায়, তাঁর 'জুপিটার' কাব্যগ্রন্থেই। 'নার্সিসাস'-এর নায়িকা উত্তমপুরুষে বর্ণিত কাহিনীর কথক রূপসী মেয়েটির রূপের বর্ণনা দিতে হলে ওই প্রবাল, ইন্দ্রনীল, হাতির দাঁতের সৌন্দর্যসম্ভারের কাছেই হাত পেতে দাঁড়াতে হবে পাঠককেও, তবে রূপে চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও মোহিনী রূপবতীটির মনের রং চিনতে সময় লাগবে আরো একটু। এমনটাই হয়েছিল সহপাঠিনী-মহলে মনোহরণ রূপবান প্রতিভাবান প্রশান্ত গুহেরও, রূপ লাগি যার

আঁখি ঝুরে নিশিদিন, নায়িকার সৌন্দর্যছন্দে রক্তের গান বাজে ধমনীর মাঝে, সেই প্রেমিকের হাতে নিজের এই রূপের ডালি তুলে দিয়েছিল মোহিনী, তবে এক বিশেষ স্বার্থে, এক নিষ্ঠুর শর্তে। আর সেটাই যেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠল প্রত্যাশী প্রেমিক প্রশান্ত গুহের সামনে, সেদিনই তার বিভোর মুগ্ধতামাখা চোখে জ্বলে উঠল ঘৃণার আগুন, ক্রোধে-ঘৃণায় প্রদীপ্ত তরুণটি সেদিনই 'নার্সিসাস'-এর অভিসম্পাত ঢেলে চলে গেল মেয়েটির জীবন থেকে, চলে গেল তবে এই কথা ক'টি বলেই গেল যে, "জীবনে কিছুই তুমি ভালোবাসোনি নিজেকে ছাড়া। মেয়েরা চিরকাল 'একো' রূপেই দেখা দিয়েছে, আর পুরুষ 'নার্সিসাস্' রূপে। একো ভালোবাসে নার্সিসাস্‌কে, নার্সিসাস্ জলের মধ্যে নিজের মুখের ছায়ার প্রেমে মত্ত। একোর দিকে সে ফিরেও চায়নি। মেয়েরাও যে নার্সিসাস্ হতে পারে তার প্রমাণ তুমি। নিজের রূপকেই ভালোবেসেছো, তাই তুমি নার্সিসাস। নার্সিসাসের অভিশাপই তোমার ওপর রইল, নার্সিসাস্।" সুন্দর একটি দেহ আর দেহকেন্দ্রিক লঘু মনের চর্চা ছাড়া মেয়েটি জীবনে হয়তো গভীরতর কিছুর সন্ধান করেনি এতদিন, অভিশাপদাতা তরুণটির জীবন জুড়ে প্রণয়মুগ্ধতা ছাড়াও ছিল তার মননের দীর্ঘ সাধনার ছায়া, তাই প্রবঞ্চিতের হাহাকারে, ক্ষুব্ধ তিরস্কারেও হয়তো লেগে রইল স্রষ্টার বহুপঠনের উত্তরাধিকারের এই স্বর।

কিন্তু, মেয়েরা কি সত্যি 'নার্সিসাস' হয়? নার্সিসাসের অভিশাপও ফলে কি সত্যি তার ওপর? মোহিনী মেয়েটির প্রত্যাখ্যানে ঘেরা একলা রাতের অন্ধকারে, বর্ষা-বসন্তের নিদ্রাবিহীন প্রহরে প্রহরে সুদীর্ঘ দিন পরেও কেন ভেসে আসে তবে অভিমানী যুবকের হাসি-কথা-মুখের আদল? নিজেকে ছাড়া কারোকে আজও ভালোবাসেনি যে একলা মেয়েটি, অনেকটা পথ এমন একলাই চলে এসে তারও কেন আজ মনে হয় তবে, "কেন সে আর একটু অপেক্ষা করিল না? জীবনে একমাত্র তাহাকেই ভালোবাসিতে পারিতাম।"

এইরকমই পাঁচটি মেয়ে কি পাঁচটি টুকরোয় পাঁচটি দীর্ঘশ্বাস হয়েই ছড়িয়ে আছে বাণী রায়ের 'পঞ্চকন্যা' গল্পেও? 'শূন্যের অঙ্ক' নামে বাণী রায়ের গল্প-সংকলনের প্রথম এই গল্পটিতে পাঁচটি কন্যার জীবনে শূন্যতার স্বরূপ একই, প্রেম নেই জীবনে তাদের, প্রেম থাকলেও, প্রেমের পায়ের তলায় নেই ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্ত মাটি। পাঁচ মেয়ের দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে তাই প্রতিটি সন্ধের মোহময় বাতাস, ব্যঙ্গ আর বেদনায় মাখামাখি স্বর জানায় একটা চিরকুমারী সভা খোলবার প্রস্তাব!

রমলা, অচলা, বকুল, সুলেখা কিংবা মাধবী—চব্বিশ থেকে আঠাশের এই তরুণীদের সঙ্গীরিক্ত বিরহরাতির পথগুলি যদিও একই একাকিত্বের পথের রেখায় এসে মিলে গেছে শেষ পর্যন্ত, তবে দেহে-মনে এমন একলা হয়ে যাওয়ার কারণ তাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন, সমস্যাটা সহজ বরং রমলা মাধবী বা বকুলের ক্ষেত্রে, রমলা বসুর মতো প্রথম প্রেমে প্রবঞ্চিতা কোনো চঞ্চলা লাবণ্যময়ী আধুনিক

শিক্ষাগর্বিতা তরুণী যখন কামনার্ত বহু পুরুষের বাহুতে ধরা দিতে দিতেও মনের গভীরে দীর্ঘশ্বাসের বেদনায় খুঁজে ফেরে তার প্রথম প্রেমের পরশখানি; কিংবা সুগায়িকা কবি মাধবী নন্দী যখন তার গরিব ঘরের মেঝেয় পাতা শয্যায় সূতিকাগ্রস্ত জননীর পাশে শুয়ে বিনিদ্র রাত জুড়ে অপেক্ষায় থাকে কবে তার বাগ্‌দত্ত পুরুষটি অর্জন করবে অর্থের কৌলীন্য, কেমন করে বাঁধা হবে তার স্বপ্নের ঘর; অথবা বকুল সোমের রূপ যখন পতঙ্গের মতো টেনে আনে লুব্ধ পুরুষকে, কিন্তু উৎসাহী করে না বিবাহে, কারণ, ''বকুল সোম নাচগান জানে না, আধুনিক শিক্ষার অভাবে পুরুষমহলে সে জড়পদার্থ বনে যায়। তাকে স্পর্শ করে সুখ আছে, তার সঙ্গে কথায় সুখ কই?'' তখন, তখনও হয়তো সম্ভব এই মেয়েদের জীবনে কোনো সমানধর্মার আগমন-সম্ভাবনার প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা, কিন্তু গৃহস্বামিনী সুলেখা রায় বা ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা অচলা মজুমদারের জীবনের সমস্যার রূপ মনে হয় কঠিনতর। সমস্যা তো আসলে তখনও থেকে যায় এই প্রশ্নটাকে ঘিরেই যে, ব্যক্তিত্বময়ী অথবা অভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞার শক্তিতে গরীয়সী মেয়ের সান্নিধ্য সত্যিই কতটা প্রার্থিত তার সহযাত্রী পুরুষসমাজের? আরো সহজ ভাষায় বললে, ব্যক্তিত্বে অথবা শিক্ষায়-উপার্জনে যোগ্যতর মেয়েটিকে কতখানি বরণযোগ্যা বলে মনে করে তার সমবয়স্ক কোনো পুরুষ? মেয়েদের জীবনের এই সুকঠিন বাস্তবের দিকে চেয়ে হয়তো কোনো পাঠকের আজ মনে পড়ে যায় কবিতা সিংহের ''আমিই সেই মেয়ে'' নামে বিখ্যাত সেই কবিতার এই পংক্তি ক'টি,

> আমার অসহায়ত্বের মধ্যে পুরুষের পৌরুষ ওৎ পেতে থাকে
> আমি বুঝতে পারিনি যে,
> চাকরির জায়গায় নিজের কাজের কুশলতা দেখাতে নেই
> আমি বুঝতে পারিনি যে
> আমার প্রেমিককে তার প্রেমপত্রের বানান ভুলগুলো
> ধরিয়ে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল ....
> .... আমি বুঝতে পারিনি যে,
> একবিংশ শতাব্দীর সীমানায় এসেও
> এই পুরুষ-শাসিত পৃথিবী বুদ্ধিমতীদের জন্য অপ্রস্তুত
> এখনও বিদেশে প্রতিভাশালিনীরা নির্বোধ সেজে
> ছেলেদের সঙ্গে ডেট করে।

পঞ্চকন্যাকে ঘিরে অস্থির বাতাস চাঁদের আলো আর ফুলের সুবাসে মোড়া স্বর্ণালী সন্ধেগুলি যত নিস্ফলাই মনে হোক, তবু তো সেসব সন্ধেতে অন্তত পরস্পরের সান্নিধ্যের উত্তাপ আছে, আছে আন্তরিক সখ্যের সৌরভ। কিন্তু কী নিরুপায় নিঃসঙ্গতায়, কী প্রেমহীন একাকিত্বে দিনে দিনে ক্ষয় হতে থাকে, ফুরিয়ে যেতে থাকে কোনো মলি

দত্ত বা কুসুম বাগচীদের জীবন। বাণী রায়ের 'কোনও এক মলি দত্ত' নামের গল্প থেকে উঁকি দিয়ে যায় 'আটত্রিশ বছরের চিরকুমারী' মলি দত্তের প্রাত্যহিক জীবন, একার সংসারে তাঁর একমাত্র ভরসা অথর্ব-প্রায় পুরানো ভৃত্য রুইদাস, সারা জীবনের অভ্যাসে জড়ানো একখানি জোড়া খাট, পুরানো খাটের পাশে রাখা 'ফুলদার একখানি সোফা' প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণের পর যার সামনে "টিপাই টেনে রুইদাস চায়ের ট্রে রাখে। মায়ের আমলের হাল্কা ডিমের খোলার মতো চায়ের কাপ। চা-খাওয়া যেন হয় উৎসব।" এমনি এক কোমর-পড়ে-যাওয়া বৃদ্ধ চাকরকে নিয়ে একলা সংসার বছর চল্লিশের কুসুম বাগচীরও। রোজ সকালে তার 'ট্রেতে চা আর পাতলা একটুকরো টোস্ট ওপরে নিয়ে যায়' অবশ্য আর এক ছোকরা চাকর। 'অতি সাধারণ কুসুম বাগচী' নামে বাণী রায়ের এ-গল্পে অবশ্য প্রাতর্ভ্রমণে শুরু হয় না সাধারণী কুসুম বাগচীর দিন, শুরু হয় এমনিভাবে, "জানলা খুলে যায় সকালে। রোজই খোলে। শাদা একটি মণিবন্ধ পর্দা টেনে সরায়। একটু বেশী সাদা। ......

.... হাতের বাদামাকৃতির নখের রং গোলাপী নেটের পর্দায় মিল পায়। একটু পরে এক বোঝা শুষ্ক কারনেশন ফুল হাতখানা রাস্তায় ফেলে দেয়।" পর্দার আড়ালের ধীর চলাফেরায় একলা ঘরে স্পন্দিত হতে থাকে জীবনের সুর।

কাছাকাছি বয়সের এই দুই নিঃসঙ্গ নায়িকাই, হয়তো কুসুম বাগচীর চেয়ে দু'এক বছরের ছোটোই হবেন মলি দত্ত, তবু কুসুম বাগচীকে "ক্ষীণ শুভ্র শরীরে, হাল্কা শাদা পোষাকে এখনও মনে হয় তরুণী", আর, মলি দত্তের পক্ষে প্রতিকূল তাঁর ডাক্তারি বিধানও, তাঁকে "ডাক্তারবাবু বলেছেন : সর্বদা ওজন কমিয়ে চলতে। অনেকদিনের হৃদয় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। হৃৎস্পন্দনের অনিয়মিত যতি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয়। সকালে আস্তে একতলায় নেমে কাছের পার্কে একমাইল মতো আন্দাজে সমতল ভূমিতে হাঁটা প্রয়োজন। নিত্যকার করণীয় কর্ম মলি দত্তের।" জীবনে সঙ্গীহীনতাকে বরণ করে নেওয়ার কারণও দু'জনের একইরকম নয় ঠিক, কুসুম বাগচীর "ভাবী স্বামী প্লেন চালাতে যেয়ে মৃত হয়েছিলেন। আর বিয়ে করেননি তিনি। শোবার ঘরের দেওয়ালে ছবি ঝোলে।" এই স্বীকৃতি প্রেমিককে কোনোদিনই দিতে পারেননি মলি দত্ত, মলির মৃত্যুর দশ বছর পরেও জীবিতই দেখি তাঁর প্রেমিক রবি তলাপাত্রকে, মলি দত্তের বাড়ির কাছেই আবাস তাঁর, তবু মলি দত্তের চিরকুমারীব্রতের কারণ অসবর্ণবিবাহ ঘিরে তাঁর বাবার নিষেধাজ্ঞা আর সেই আদেশ অমান্যে তাঁর অপারগতা।

তবে, আকৃতি-প্রকৃতিতে যতই প্রভেদ থাকুক নিঃসঙ্গ দুই নায়িকার, মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ যতই পৃথক হোক, একলা বিচ্ছিন্ন নিরালম্ব এক মৃত্যুর ভবিতব্যই অপেক্ষা করে ছিল দু'জনের জন্যই, অনন্তকে স্পর্শ করবার এই শেষ মুহূর্তটি একইরকম নিঃসঙ্গতায় এল দু'জনেরই জীবনের অবসানে।

তবে কি বিবাহই যথার্থ উত্তর? বিবাহেই আছে একাকিত্ব-ঘোচানো সুখের ঘরের চাবি? রবি তলাপাত্রকে অসবর্ণ বিবাহের বাধা দূর হলেই সুখী হতেন মলি দত্ত, কিংবা, প্লেন-দুর্ঘটনায় যতি টানা না হলে কুসুম বাগচী? তবে কেন বাংলাদেশের এক গৃহবধূর মুখে শুনি, " .... আজ বাংলার গৃহে গৃহে এই সব রমণীর প্রাচুর্য্য, যাদের সহধর্ম্মিনী বলতে কেবল শয্যাসঙ্গিনী বোঝায়; যাদের ক্লান্ত অসহায় মুখে, দীপ্তিহীন নেত্রে যুগান্তের শ্রান্তি, ভীতিসঙ্কুল পরাধীনতা লেখা রয়েছে। আত্মা তাদের নেই, মন তাদের হত্যা করা হয়েছে! দিনের পর দিন চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত তারা সংসারের চাকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে, অবাঞ্ছিত সন্তানের পাল লালন করছে। শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে, ননদ জায়ের মন জুগিয়ে, স্বামীর সমস্ত দাবী মিটিয়ে তবে না বধূ নামের সার্থকতা! যদি কখনও বাবা, মা, ভাইবোনের জন্য মন খারাপ হয় তবে সেটা ন্যাকামী; যদি নিদারুণ গঞ্জনায় মুখে একটি কথা আসে তবে সেটা পাপ। কেরাণীর ছুটি আছে, দাসদাসীর ছুটি আছে, তার নেই।"

'বধূ' নামে বাণী রায়ের এক গল্পে এই কথাগুলি ভাবছিল মালঞ্চমালা নামে বাংলার এক কালো মেয়ে, বাংলাদেশের হাজার হাজার কালো মেয়ের ভিড়ে মিশে থাকা যে-কোনো একটি মুখেই হয়তো আঁকা আছে এই গৃহবধূটির মুখ। 'শূন্যের অঙ্ক' নামে তাঁর বিখ্যাত গল্প-সংকলনটির নানা গল্পে নারীজীবনের নানান কোণে আলো ফেলেছিলেন বাণী রায়, কন্যা জায়া জননী—নানা পর্বে-পর্যায়ে ভেঙে ভেঙে মেয়েদের জীবনের লেখা-না-লেখা পাতাগুলোকে দেখে নিতে চেয়েছিলেন নানা তাৎপর্যে। তবে, প্রশ্ন যেমনই হোক, সন্ধান যে-পথেই হোক, শূন্যকে শূন্য দিয়ে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যা-ই করা হোক না কেন, যতভাবেই কষা যাক না কেন শূন্যের অঙ্ক, উত্তর তো সবসময়ই পৌঁছে দেবে বিরাট এক শূন্যেরই মুখোমুখি; মেয়েদের জীবনও যে তাই-ই, যেমনভাবেই অঙ্ক কষো হিসেবের খাতায়, তাদের জীবনখাতার শেষ পাতাটিতে ঠিক পড়ে থাকবে কেবল একটা অনিঃশেষ শূন্যের গভীর অতৃপ্তি!

মালঞ্চমালা নামে এই যে মেয়েটি, বাপের বাড়িতে আদর করে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র আদলে নাম রাখা হয়েছিল যার, কিন্তু নাম তার ভাগ্য বদলাতে পারেনি, কলকাতার কালো মেয়ের জন্য পাত্রই জোটেনি কলকাতার আশেপাশে, দূর পাড়াগাঁয়ে আই. এ. পাশ জমিদারের কর্ম্মচারীর ঘরণী হয়ে এসে কিশোরী এক মেয়ের দু'চোখ ফেটে জল আসতে চাইত মিটমিটে রেড়ির তেলের প্রদীপ দেখে, ঝোপেঝাড়ে শেয়ালের ডাক শুনে, সন্ধে না হতেই নিঝুম হয়ে আসা গাঁয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে, কিন্তু তা বললে কি সংসার চলে? উদাসীন অতিথিবৎসল শ্বশুর, রাগী স্বামী, শুচিবায়ুগ্রস্তা পূজাপাঠে উৎসাহী শাশুড়ী আর বিধবা বড়ো জা-কে নিয়ে সংসারের পথ চলা শুরু করেই কিশোরী এই মেয়েটি জেনেছে, 'সংসারটি অনেক লোকের হলেও কাজ একা মালঞ্চের', আর চলতে চলতে কাজ জমছেও তার প্রচুর, একুশ বছর বয়সেই

মালঞ্চেরই তো তিন ছেলেমেয়ে, 'বধূ নামের সার্থকতা' ঘিরে অত কথা যে সে ভাবছিল, সে তো এই কারণেই, মালঞ্চের পরিশ্রমী হাত দুটি ছাড়া সংসারের চাকা অচল বলেই তিন বছরের মধ্যে একটি দিনও বাপের বাড়ি যাওয়ার ছুটি মেলেনি তার। 'বধূ' নামের এ-গল্পও এক আশাভঙ্গেরই গল্প, অনুপস্থিতিকালের সম্ভাব্য সমস্ত কাজ গুছিয়ে রেখে তিনটি বছর পরে পুজোর সময় মায়ের কাছে যাওয়ার আশায়-আনন্দে একুশ বছরের মালঞ্চ যখন উদ্বেল, শ্বশুর পড়লেন জ্বরে, আর বাড়িতে আরো এতগুলি মানুষ থাকা সত্ত্বেও, মালঞ্চের ভীরু অনুনয়ের উত্তরে শোনা গেল তার স্বামীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠ, "বাপের বাড়ী যাওয়ার নামে পাখা মেলে ধরেছেন, শ্বশুরের অসুখ গ্রাহ্য নেই! ..... আমার হুকুম তুমি যেতে পাবে না।" ছেলের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে শাশুড়ির প্রসন্ন কণ্ঠে ঝরে পড়ল উপদেশ, "..... এবারে তোমার যাওয়া নিয়ে যখন এত বাধা, একেবারে না যাওয়াই ভালো। সামনের পুজোয় আমি নিজে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কাল ভাই আসছে আসুক। তাকে বুঝিয়ে ফেরৎ পাঠালেই হবে।" ....

এমনই তো কুমারী বধূ জননীদের, বাংলার ঘরে ঘরেই, সমাদৃতা বা অনাদৃতা, পরিগৃহীতা বা প্রবঞ্চিতা, সংসারে প্রয়োজনীয়া বা উদ্বৃত্ত বোঝা অথবা কেবল রমণীয় শোভা— যেমনই হোক তার উপস্থিতির তাৎপর্য, জীবনজোড়া তার ওই এক শূন্যের অঙ্কই সম্ভব। মালঞ্চমালা নামে ওই একুশ বছরের বউটি কি জানে না, সামনের পুজোয় আরো কত বাধা এসে দাঁড়াতে পারে তার বাপের বাড়ি যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটুকুর পথ রোধ করে, অবিরল চোখের জলে কি এতটুকু মসৃণ হয় সংসারের শেকলে বাধা ক্রীতদাসীর মুক্তির পথ?

ক্রীতদাসীরই জীবনযাপন বলা যাবে কি উনিশ বছরের মাধবী নামে এই মেয়েটির সম্পন্ন যাপনের দিকে চেয়ে, নিজেরই সুখের সংসারের দাবিতে কত রাত নিশ্চিন্ত বিশ্রামের ঘুম নামেনি যার ক্লান্ত দু'চোখের অবসন্ন পাতায়? 'জননী' নামে বাণী রায়ের এ-গল্প সর্বকনিষ্ঠা কিশোরী ননদিনীটির বিরক্ত চোখে দেখা তার মেজবৌদি মাধবীর একটি রাতের যাপনচিত্র। উপর্যুপরি তিনটি সন্তান এই মেজবৌদিটির, ঘরে তার রুগ্ন দুরন্ত অথবা আবদেরে কিংবা মাঝরাতে মা-কে পা টিপে দেওয়ার হুকুমপরায়ণ শিশু, মেজদাবিহীন একটি মাত্র রাত বৌদির ঘরে কাটাতে বাধ্য হয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রার ব্যাঘাতে বিরক্ত ননদিনীর ভাবনাস্রোত জানায়, "বড় রাগ হল। .... দয়া করে ঘরে শুতে এসেছি, তাও পদে পদে ঘুমের ব্যাঘাত! বউদি যেন জানেন না ভালো ঘুম না হলে আমার মাথা ধরে? রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়ে বউদিকে তুলে বাক্যবাণ বর্ষণ করব বলে হাত বাড়ালাম। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে আমার ঘুম থেকে তোলা হল কই?

তখন প্রায় শেষ রাত্রি। পাণ্ডু প্রভাতী আলো নীল বিজলি বাতির সঙ্গে মিশে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে। সেই আলোতে দেখলাম তিন সন্তানের পাশে সুপ্তা এই উনিশ বছরের মেয়েটির অধরে, ললাটে কি যুগান্তের শ্রান্তি লেখা আছে।"

শেষ রাতে এমন অগাধ শ্রান্ত ঘুমে তলিয়ে গেছে যে তরুণী বধূটি, সারা রাত তার কেটে গেছে কোনো না কোনো শিশুর পরিচর্যায়, তার নিদ্রাশিথিল কণ্ঠের ঘুম-পাড়ানী ছড়ার মৃদু গুঞ্জন-সুর শুনতে শুনতে তার ননদিনীর "স্বপ্ন-জাগরণের মধ্যে মনে হয় সে সুর আমার পাশের বিছানা থেকে শুধু আসছে না। সে যেন সারা বাংলাদেশের জননীদের ক্লান্ত স্বরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। আধো ঘুমন্ত চোখের সামনে ভেসে আসে কত শত শত রুগ্ন রোরুদ্যমান শিশুর শিয়রে কত রুগ্না সূতিকাগ্রস্ত জননী, ছেলেমেয়েদের উৎপাতে যাদের মুখের যৌবনসুলভ লাবণ্য মুছে গেছে, যাদের অসহায় নয়ন অতৃপ্ত-নিদ্রালাঞ্ছিত।"

ললাটে, অধরে যুগান্তের শ্রান্তি মেখে নীরব নতমুখে 'পরের মুখের হাসির লাগিয়া' সংসার করে চলেছে এই যে বাংলাদেশজোড়া তরুণী বধূ আর জননীর দল, কোন অস্ফুট কৈশোরে হয়তো পিছনে ফেলে এসেছে খেলাঘরের খুঁটিনাটি, হাসি আর কথার স্বাধীনতা, বাবা-মা-ভাই-বোনের জড়ানো সরল খুশির সংসার, সেই ঘরণী মেয়েটি নিজে কী চায়, কে কবে তা জানতে চেয়েছে? দাম্পত্য কি সত্যিই মনের মানুষের সন্ধান দিয়েছে তাদের, একুশ বছরের মালঞ্চমালা আর উনিশ বছরের মাধবীকে? কে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের বাপের বাড়ি না যেতে পারা মনখারাপের চোখের জল মুছিয়ে দিতে, না ঘুমানো রাতগুলি আর একটু সুসহ করে তুলতে? ভরা সংসারের মাঝে বসে তাদের গহন মনের একাকিত্বের সত্যি আছে কোনো সঙ্গী?

সুখ কি তবে কুমারীজীবনের স্বাধীনতায়? সে-স্বাধীনতার সুখ ভেঙে ফেলতে কেন তবে আগ্রহী হয় 'আবিষ্কার' গল্পের সুমিত্রা? জীবনে যা যা প্রাপনীয়, সবই তো নিজের সামর্থ্যেই অর্জন করে নিয়েছিল সাতাশ বছরের সুন্দরী সুমিত্রা রয়, আরাম আর বিলাসের নিবিড়তায় ঘেরা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির উঁচুদরের অফিসর সুমিত্রার একলার ঘরে উঁকি দিলে চোখে পড়ে তার সুসজ্জিত প্রসাধন টেবিল, কোণের রেডিও, ছোটো সেক্রেটারিয়েটের ওপর সাজানো কলম-পেন্সিল-মনোগ্রাম করা কাগজ-রূপোর কাগজচাপা, খাটের নীচে ফার বসানো চটিজুতো, যার প্রতিটি বস্তু সুমিত্রার নিজের উপার্জনে কেনা, 'সে যা চেয়েছিল—প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, সম্মান সবই পেয়েছে।' তবে কেন প্রতিষ্ঠাগর্বিত সুমিত্রার মনও মাঝে মাঝেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে বনেদী একান্নবর্তী পরিবারের ছোটো ছেলে প্রদীপের জন্য, যে সুমিত্রার চেয়ে কম মাইনে পেয়েও সন্তুষ্ট? বিবাহসম্ভাবনার খবর দিয়ে মনের পুলকপ্রবাহ গোপন করতে করতে বান্ধবী সুধীরা চলে যাওয়ার পর নিজের মনেই এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় সুমিত্রা, যখন দেখে, "চারিপাশে তার রচিত হয়েছে একটি নিঃসঙ্গতার দুর্গ, খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জগতের সমস্ত নিঃসঙ্গ নারীহৃদয়ের বিলাপ।" তখনই বোঝে সে, "ঠিক এই নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকে এড়াবার জন্য নারী স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়। তার সমস্ত বন্ধুরা তাই বিবাহ করেছে, তাই সুধীরা বিবাহে উৎসুক।"

আপন মনের গভীরে খুঁজে দেখে সুমিত্রা, কী চায় সে নিজে, উত্তর মেলে, "চাই পরম নিঃসঙ্গতাকে এড়িয়ে যেতে। আমার গৃহ রচিত হয়েছে আমার নিজেকে কেন্দ্র করে, আমার প্রাত্যহিক সুখের উপকরণ সযত্নে আহৃত করে। অন্য কোন ব্যক্তির জন্য চিন্তা-দুশ্চিন্তার মাধুর্য্যপূর্ণ ব্যাকুলতার স্বাদ আমার জগৎ জানে না। চাই এই আত্মঘাতী আত্মকেন্দ্রিকতাকে এড়িয়ে যেতে। ..... আমি চাই অসংখ্য পরিজনকে অসংখ্য স্নেহের বন্ধনে বাঁধতে; তাদের জন্য প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার ও অসুবিধা-অনটনের মধ্যে আমার অতৃপ্ত অন্তরের অপরিসীম ভালবাসার প্রবৃত্তিকে ধন্য করতে। নিজেকে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। আমার পূর্ব্বে সহস্র নারী যা করেছে, আমার পরে সহস্র নারী যা করবে, আমিও তাই করতে চাই। একটি সাধারণ ছকের অঙ্গীভূত হয়ে জীবনের জটিলতাকে অতিক্রম করতে চাই।" এই সিদ্ধান্তের পরেই সুমিত্রার দৃঢ় স্বর শোনা যায় টেলিফোনে—"প্রদীপবাবু বাড়ী আছেন? একটু ওঁকে ডেকে দিন না ....."

একলা মেয়ের পথ-চলাটি সুন্দর করে তোলার আশ্রয় তবে পুরুষের প্রেমের ওই প্রতিশ্রুতিটুকুই, জীবনে যার ছোঁয়া থাকলে জীবন ঝলমল করে ওঠে বিন্দুতে বিন্দুতে। বাণী রায়ের 'নার্ভাস' গল্প নইলে কী শোনায় তার পাঠককে, পারিবারিক পরিবেশের সমস্ত সজীবতা দিনভর প্রতি মুহূর্তে দলে মুচড়ে দিতে থাকে সুমিতা নামে যে কেরাণী মেয়ের নার্ভগুলোকে, সকালবেলা ছোটো ভাইবোন আর ছোটো ছোটো ভাইপো-ভাইঝিদের ছাদে বল খেলার কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠতে হলে যার ইচ্ছে হয়, 'ভাই-ভাইপো নির্বিশেষে গলা টিপে ধরে গোলমালের মূলোচ্ছেদ করে' দিতে, কর্মক্লান্ত দিনের শেষে অভুক্ত তিতিবিরক্ত বিধ্বস্ত সেই মেয়েটির কানেই কেমন করে মধুবর্ষণ করে ওই ছেলেমেয়েদেরই বৈকালিক বল-খেলার গোলযোগ, কেমন করে 'স্নেহের হাসি' ছড়িয়ে তারই মনে হয়, "কী সজীব ছেলেমেয়েরা!" যে মন্ত্রে এই অসম্ভব সম্ভব হয়, সে তো দূরপ্রবাসী প্রেমিকের মস্ত এক চিঠিতে ভেসে আসা প্রবল এক আশ্বাসের সুর, কোটি মন্বন্তরেও, বহু ব্যবধানেও দূরে-যাওয়া প্রেম ভোলেনি তাকে, দীর্ঘ দিন পরে ফিরছে সেই না-হারানো প্রেম তারই একলা মনের সান্নিধ্যে, এই বিশ্বাসের আমন্ত্রণ-সকালে-বিকালে আমূল বদলে যাওয়া এ-মনের ম্যাজিক ঘটে গেছে তো তাতেই।

এই ম্যাজিকেরই প্রত্যাশা কোনোদিন ছিল কি ওই বিবর্ণ-ক্লান্ত একটু নিরাসক্ত, অনেকটা উদাসীন বছর বত্রিশের নারীমুখটিতে, কালিঘাটগামী ট্রামে জানালার পাশের লেডিস সিটে প্রতিদিন বেলাশেষে নির্ভুল নিয়মে যে-মুখ ভেসে ওঠে? 'কুমারী' গল্পের এই সহযাত্রিনীটি সম্পর্কে জানা হয়নি কিছুই, শুধু চোখে পড়েছে তাঁর সাধারণ বেশভূষা, কালো ভোমরাপাড় শাড়ি, হাফহাতা শাদা জামা, মণিবন্ধে তিনগাছি মিশ্রীকাটা চুড়ি, আর কানে মুক্তাচুনি বসানো, একটু অসমঞ্জস এক কর্ণাভরণ। প্রতিদিনের নির্লিপ্ত ট্রামযাত্রায় একদিনই, সামনের আসনে বসা এক তরুণ দম্পতিকে

দেখে একটু আগ্রহ জেগেছিল তাঁর চোখেমুখে, তরুণ স্বামীর ওপর তরুণী স্ত্রীর নির্ভরতার ছবিটি দু'চোখ মেলে দেখে খুব মৃদু একটি দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। এইটুকুই গল্প, ট্রামের তরুণ সহযাত্রীটির চোখে দেখা, অনেকবার ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও যার আলাপ করা হলো না বিষণ্ণ ওই নারীর সঙ্গে, শুধু মনে রয়ে গেল, "অগোছালো সামান্য বেশভূষার মধ্যে কানে সেই মুক্তাচুনি-বসানো দুল, আর নির্লিপ্ত ঔদাস্যের মধ্যে একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস।"

কিংবা স্কুলশিক্ষয়িত্রী কনক বসু? এমন কোনো ভালোবাসা ম্যাজিকের মতো ঘুচিয়ে দিতে পারত কি তাঁরও নিঃসঙ্গতার বেদনা? 'প্যারালেল লাইন' গল্পে খড়্গপুর স্টেশনে আলোকোজ্জ্বল কামরায় বসে কনক বসু মুখোমুখি হয়েছিলেন ভূপেনবাবুর। আজ ট্রেন ছেড়ে দিল বলেই কি কেবল সমান্তরাল হয়ে বেঁকে গেল দুজনের চলার পথ, এমনি সমান্তরাল পথে চলেছে দু'জনের জীবনরেখা, সে-ও তো হলো বহুদিন, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ানোর চাকরি-করা ইন্সপেক্টর ভূপেনবাবুকে অনেকদিন আগেই তো বরণযোগ্য মনে করেননি উচ্চাকাঙ্ক্ষা কনক বসু; তবু তো আজ জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবেন কনক বসু, "কেন আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি? সেখানে আমার জন্য কী আছে?" আর প্যারালেল লাইন চলতে চলতে চলন্ত গাড়ির কামরাটি বার বার ভেসে উঠতে থাকে ভূপেনবাবুর মনে, বারে বারে মনে বাজে, 'ওখানে যদি আমি আশ্রয় পেতুম', পুত্রকন্যা পরিবৃত নিরানন্দ ঘর, রুগ্ন কলহপ্রিয়া স্ত্রীর কথা ভেবে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তাঁর মন বলে, "যদি যেতে না হত! ..... সেখানে আমার জন্য কী আছে?"

এইরকমই কত ভালোবাসা-ভালো-না-বাসার সহজ-কঠিন দ্বন্দ্বে-ছন্দে চলেছে বাণী রায়ের গল্পে ভালোবাসার জগৎ, কখনো-বা ভালোবাসা আর নিঃসঙ্গতার যুগলবন্দীর জগৎ। 'ভালো তো গো বাসিলাম, ভালোবাসা পাইলাম/এখনও তো ভালোবাসি, তবুও কী নাই ....'। 'ভালোবাসা পাইলাম'—সত্যি কিনা এই কথাটা, তারই বিচারের উপর তো দাঁড়িয়ে আছে একালিনী এক লুক্রেশিয়ার আখ্যান। স্রষ্টার বহুপঠনের অভিজ্ঞতায় জড়ানো বাণী রায়ের 'লুক্রেশিয়া' গল্পের যথার্থ আস্বাদ পেতে হলে কিন্তু আজকের পাঠককেও জানতে হবে কোলোটিনাসকে, সেক্‌টাসকে আর তাদের মাঝে লুক্রেশিয়াকে, শেক্সপীয়রের এই লুক্রেশিয়া-কাহিনীকে একবার স্মরণ করে না নিলে গল্পের উপভোগও তার ব্যর্থ হয়ে যাবে অনেকখানি।

রূপসী প্রতিবেশিনী আর সহপাঠিনী মালিনী সেনকে ভালোবেসেছিল অমর সোম, এ-গল্পের লুক্রেশিয়া আর কোলোটিনাসও তারা দুজনেই। শেক্সপীয়রের লুক্রেশিয়া-কাহিনী জানিয়েছিল, স্বামী কোলোটিনাস যখন বাইরে, নির্জন ঘরে সেক্‌টাস আক্রমণ করেছিল লুক্রেশিয়াকে, এ-অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল কোলোটিনাস। সেই পুরাকাহিনীই এক নবীন রূপে ফিরে এল আধুনিক যুগে, একনিষ্ঠ প্রেমিক অমর নয়,

মালিনী ভালোবাসল রূপবান প্রতিভাবান প্রবীর গুহকে, তার রমণীবিলাস সম্পর্কে অমরের সহস্র সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে; মালিনী ফিরে এল একদিন, চোখ দুটি তার আরক্ত, ঠোঁট স্ফীত, খোঁপা খুলে লুটোচ্ছে পিঠে, শাড়ি কাদামাখা, জামা ছিন্নভিন্ন, 'সমস্ত শরীর তাহার যেন কেহ শুষিয়া মুচড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে।' মালিনীর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার ছোঁয়া, "তুমি যাবে অমর? .... আমি যেমন কষ্ট পেয়েছি, সেই কষ্ট তাকে দিতে হবে। .... মাটিতে তার মাথা লুটিয়ে দিয়ে সেই মুখ তোমার জুতো দিয়ে থেঁতলে দিও। যে হাতে ঘৃণ্য প্রবৃত্তিতে আমাকে ধরেছে, সেই হাত তার জন্মের মত ভেঙে দিও। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ভাল সে আমাকে বাসে নি। আজ স্পষ্টই বলেছিল।" কিন্তু এখানেই তো শেষ হয়নি মালিনীর কথা, তার পরেও একটি অস্পষ্ট স্বর ভেসে এল প্রতিশোধগ্রহণে প্রস্তুত কোলোটিনাসের কানে, মালিনীরই সে কণ্ঠস্বর, 'তাকে প্রাণে মেরো না অমর।' শোধ নিল আধুনিক কোলোটিনাসও, পঙ্গু করে দিয়ে শাস্তি দিল রমণীমোহন প্রবীর গুহকে, কিন্তু তার আগেই জীবনের এক পরম সত্য জানা হয়ে গেছে তার, সেই অস্পষ্ট স্বরের ক্ষণিক উচ্চারণ তাকে জানিয়ে দিয়ে গেছে সেই নির্মম কিন্তু অনিবার্য সত্য, 'আমার লুক্রেশিয়া আজীবন সেক্‌টাসে আসক্তা' পাওয়া-না-পাওয়ার তীব্র-গভীর দ্বন্দ্বই এ-গল্পের বিষয়, একমাত্র বিষয়; তবু, নিঃসঙ্গতা ছাড়া, একাকিত্বের দহন ছাড়া ভালোবাসার আকঙ্ক্ষায় আর কী-ই বা মিলল এ-গল্পে?

তীব্র এক না-ভালোবাসারই গল্প বলব কি 'বর্ষাবিজয়' নামে এ-গল্পটিকে? সংঘাত এ-গল্পে মা-মেয়ের সম্পর্কে, না-ভালোবাসার তীব্রতা হিংস্র দুঃশ্চরিত্র অপরূপ রূপসী মায়েরই জীবনের জ্বলন্ত সত্য, প্রবাদবচনে যে বলে, স্নেহ নিম্নগামী, সেই স্নেহ দিয়েও হয়তো নিজেরই একমাত্র মেয়েটিকেও কখনো ঘেরেনি তাঁর আধিপত্যপরায়ণ মন। মায়ের এই অধিকারবোধের দাপট, তাঁর অগাধ বৈভবের রহস্যময় উৎস, সেই সঙ্গে মায়েরই অপরাধপ্রবণতা, তাঁর হিংস্র দাঁত-নখের ঝলক নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে গল্পের গতি, তবু মেয়ে পদ্মিনীর একনিষ্ঠ প্রেমিক কল্লোলের প্রণয়গভীরতাও ভালোবাসার স্নিগ্ধ পাড় বুনে চলেছে তারই পাশে পাশে। ভালোবাসার শক্তিতে ফুলে ফুলে সংসার ভরিয়ে তুলেও ঘনঘোর বর্ষাদিনে মনের গভীরে নিঃসঙ্গতা হানা দেয় পদ্মিনীর। বর্ষাই তো পদ্মিনীর ভালোবাসাকে বাঁচিয়েছিল তার মায়ের খর তীক্ষ্ম আক্রমণ থেকে, তবু পদ্মিনী ভুলতে পারে না, "কিন্তু সে যে নিল, অনেক নিল। যেখানে আমার ব্যথা, সেখানেই যে প্রাণস্পন্দন আমার। ... যে ভেসে গেল, সে যে আমার সকলের বড় আত্মীয়। সে যে আমার মা।" কল্লোলের নির্দেশে এমন বর্ষাদিনে ছেলে-মেয়ে জড়িয়ে রাখে পদ্মিনীকে, তবু পদ্মিনীর যে 'এমনি নিবিড় বাৎসল্যের মুহূর্তে যাঁকে ভুলতে চাই, তাঁকেই মনে পড়ে বার বার।' মায়ের স্মৃতির বিষামৃত পদ্মিনীকে সকলের মাঝে থেকেও একলা করে দেয় এমনি সব বর্ষাসঘন মুহূর্তে।

অনেক রহস্যময় না-এর মধ্যে দিয়ে বোঝা-না-বোঝার অনেকখানি পথ চলে

এসে জীবনের হ্যাঁ-কে পেয়েছিল পদ্মিনী, আর ‘একটি মেয়ের কথা’ শুনিয়েছিলেন বাণী রায়, সে-মেয়ের নামও মৃণালিনী। কেবল নামে নয়, জীবনকথার পাতায় পাতায় মিল আছে তাদের আরো। অনেকখানি কালোর সঙ্গে লড়াই করেই জীবনে আলোর খোঁজ পেতে হয়েছিল মৃণালিনীকে। জীবনসূচনায় পদ্মিনীর সঙ্গে একটা বড়ো অমিল ছিল অবশ্য মৃণালিনীর, মৃণালিনী ছিল বালবিধবা, বাল্যবিবাহের জন্য চিরদিন ক্লাসে প্রথম হওয়া মেয়েটি সাঙ্গ করতে পারেনি স্কুলের পড়াও। একটু একটু করে নিজের পায়ের তলার মাটি তৈরি করেছে মৃণালিনী, একুশ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছে, অঙ্ক পরীক্ষার দিন প্রচণ্ড পিপাসায় ভেঙে ফেলেছে নির্জলা একাদশীর পিত্রালয়শিক্ষিত সংস্কার, শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে বউদির দাদা হেমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে। এই স্কুলের সূত্রেই হেমচন্দ্র এসেছে মৃণালিনীর জীবনে, নায়ক-নায়িকার এ-নাম দুটি নিশ্চিতভাবেই স্রষ্টার ইচ্ছাকৃত চয়ন, বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে রেখেই। এরপর এ-গল্প একান্তভাবেই ভালোবাসার গল্প, ঘরহারা মৃণালিনীর ঘরকে জয় করার গল্প, আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প। জীবনের শুরুতেই একেবারে একলা হয়ে গিয়েছিল মৃণালিনী, গল্পের শেষে জীবনের যে বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে সে, আর নিশ্চয়ই তাকে একা হতে হবে না কোনোদিন।

ভালোবাসার, প্রতিষ্ঠার, নির্ভরতার সৌন্দর্যমাখা গল্পের পর কী বলব ‘শুদ্ধি’ নামের এই আশ্চর্য গল্পটিকে? দাঙ্গার আবিলতায় যখন বেআব্রু হয়ে গেছে ঘর, সীমারেখা মুছে গেছে বাহিরে-অন্দরে, এ তেমন এক সময়েরই গল্প। বাড়ির রূপসী মেজোবউ রমাকে অপহরণ করেছিল দুর্বৃত্তরা, চারদিন পরে উদ্ধার করা গেছে তাকে, শুদ্ধির আয়োজনও তারই জন্য। বিপুল মাত্রায় নারীহরণের পর এবারের দাঙ্গা শেষে অপহৃতা নারীকে ফিরিয়ে নিচ্ছে সব পরিবারেই, কারণ “ঘরে ঘরে মাটির হাঁড়ি অশুদ্ধ হয়েছে, ফেলে দিলে আর চলে না। সুতরাং গোবর-গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে শুদ্ধ করে নাও। অন্তত মোটা রান্নাটাও তো চলবে।” তাই শুদ্ধি শেষে রমাকেও ফিরে নেবে তার শ্বশুর পরিবার। তেরো বছরের দাম্পত্য পেরিয়ে এক কন্যা দুই পুত্রের জননী রমা তাই লালপাড় কোরা শাড়ি পরে বসেছে কুশাসনে। ছোট্ট নামের, ছোট্ট মানুষটি নির্বাক, কিন্তু মন তার তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে কথার ভারে, “কেন এসব করছি? আমার কী দোষ? পাপ করিনি, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! শুদ্ধি? কার? আমার? না, আমার না, সেই নদীর পারে সহরের অসংখ্য বড়লোকদের, যাদের লোভ আর বিদ্বেষের ঝড় বয়ে গেল আমার উপরে।

প্রায়শ্চিত্ত আমি করব কেন? আমার স্বামী করুক, সপ্তপদীর সুমধুর মন্ত্রের পাকে পাকে আমার রক্ষার ভার যার সর্বাঙ্গে জড়িয়েছে। চন্দন-টোপর পরে স্ত্রীর অগ্রে পদক্ষেপ করলেই বিষ্ণু হওয়া যায় না। প্রায়শ্চিত্ত করুক সেই পুরুষ, যে নারীকে রক্ষা করতে পারে না। করুক সেই তরুণেরা, এখনও সিগারেট-অধরে যাদের পরচর্চার প্রলোভন আছে।”

রমার মনের তোলপাড়ের ভাষা শুনতে শুনতে স্রষ্টা যোগ দিয়েছেন রমার সঙ্গে আলাপচারিতায়, "কী নির্বোধ রমা! যুগ যুগ ধরে তো তুমি এই করেছ। রামের সীতা, সীতারামের রমা রূপে তুমি তো চিরকাল এই করেছ। অক্ষম পুরুষের অক্ষমতার জের টেনেছ তুমি, তোমার বিচার করেছে সেই অক্ষম পুরুষ। হাস্যকরভাবে তোমার শুদ্ধির বিধান দিয়েছে সেই পুরুষ দয়ার্দ্র চিত্তে। তুমি আত্মহত্যা করলে তোমার যশোগান গেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তোমাকে প্রগতিশীলা দেখলে নিন্দা করেছে, বিবাহ করে সমান অধিকার দিতে চায় নি। অবলা তুমি, স্বেচ্ছায় রক্ষার ভার সবলের হাতে তুলে দিয়ে পরাধীনতার আরামে নিমগ্ন ছিলে। আজ আশ্চর্য হচ্ছ কেন? তোমার ব্যথায় নেতাদের মাথা ধরে উঠেছে। যে যা বলে, করে যাও। তোমার আগে অনেকে করেছে, তুমিও কর। কিন্তু রমা, তোমার পরে কেউ করবে কিনা জানি না।"

কিন্তু এ-গল্পই যতখানি না-ভালোবাসার, ততখানিই তো ভালবাসারও। স্বামীর কপট নিদ্রায় প্রতিহত রমা যখন মাঝরাত্রে এসে বসে নির্জন পুকুরঘাটে, তখন সে নির্ভয়। "ভয় কি তার? সমস্ত জগতের বিশালতায়, জনতার পদচারণে রমা একা। তার কেউ নেই। তার দেশ নেই, দেশবাসী নেই। রমার কথা ভেবে কেউ নিদ্রা ব্যাহত করবে না। রমার গান্ধী নেই, জওহরলাল নেই। রমা বড় একা।" কিন্তু রমা ভয় না পেলেও রমার জন্য ভয় পেয়েছে একজন, পুকুরের সামনের চালাঘরের দুলে-বউ, রমাকে ঘরে ফেরার কথা মনে করাতে অত রাতে সে-ই বেরিয়ে এসেছে নিজের ঘর ছেড়ে। "রমার অবশ শরীরে দক্ষিণের হাওয়া লাগল। আর তো সে একা নয়। হাত বাড়িয়ে রমা দুলে বউয়ের হাত ধরল।" রমাকে ছোঁয়ার অধিকার নেই দুলে-বউয়ের, তবু রমা হাত ছাড়ে না তার, "এমনই অনেক দুর্ব্বল হাত পরস্পরকে আশ্রয় দিলে বল আপনি আসবে। বহুদিন চলে গেছে পুরুষের মুখ চেয়ে। আজ এমনই কোমল হাতের শক্তিই প্রয়োজন। রমা তো আর একা নয়।" তাই অস্পৃশ্য দুলে-বউয়ের হাত ধরেই উঠে দাঁড়াতে চায় রমা, সহজ গলায় বলতে পারে, "ঘরেই যাচ্ছি। আমাকে একটু এগিয়ে দেবে চল।"

ধ্রুবপদের মতো এ-গল্পেরও শেষে বারে বারে ফিরে এসেছে রমার অনুভব, 'রমা তো আর একা নয়'। সমাজ-সংসার-স্বামী-সন্তান সব কেমন হঠাৎ অচেনা হয়ে গিয়েছিল রমার, এতদিনের চেনা পৃথিবীটা পর হয়ে গিয়েছিল এক পলকে, আর জনারণ্যে দাঁড়িয়ে জীবন জুড়ে যাদের কাছের মানুষ বলে জেনে এসেছে, তাদের মধ্যিখানে দাঁড়িয়েই কেবলই একা হয়ে গেছে রমা, হারিয়ে গেছে তার পরিবার-গ্রাম-দেশ-পৃথিবী। বিশ্বাসহারা এই সময়ে কখন তার হাতে এসে লাগল সমব্যথার ছোঁয়া, অশুদ্ধকে শুদ্ধ করবার উদারতার ভান নিয়ে নয়, মানুষকে মানুষের সম্মান দিয়ে আর একটি মানুষ এসে দাঁড়াল তার পাশে, রং ফিরে এল রমার বিবর্ণ পৃথিবীতে, হাওয়া বইল, আলো এল, রমার ভাঙাচোরা পৃথিবীতে প্রাণ জাগল আবার। না-ভালোবাসা থেকে ভালোবাসায়, নিঃসঙ্গতা থেকে সখ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল রমার জগৎ।

সংসারে-দাম্পত্যে-যাপনে নিঃসঙ্গতাই কি নয় আমাদের, একালের মানুষের বিধিলিপি? এক আহত বেদনার্ত নিঃসঙ্গ হৃদয়ের ইতিকথাই শোনাতে বসেছিল 'তিনটি দিন' নামে বাণী রায়ের এক গল্পও। শোনাতে শোনাতে বুঝতে চেয়েছিল, একদিনের প্রণয় যদি আগামী কোনো দিনে বদলে যায় প্রত্যাখ্যানে, তবে নিঃসঙ্গতাই কি কেবল সঙ্গী হয় প্রত্যাখ্যাতার, লজ্জায় বেদনায় ম্লান আহত হৃদয়টি লুকোবার নিভৃতি খুঁজে ফেরে কোথায়! 'তিনটি দিন' গল্পে সুমনা নামের এই প্রণয়ী-প্রত্যাখ্যাত মেয়েটি মাত্র তিনটি দিনের ছুটিতে ছেড়ে এসেছিল তার স্মৃতির শহর, আর তিনটি দিনের দেশ-কালের সুদূরতা আর বিচ্ছিন্নতা, নতুন মানুষজনের সঙ্গে হাসি-গানে-আনন্দে মেতে উঠতে পারার ক্ষমতা নতুন শক্তি জোগাল সুমনার অবসন্ন দেহে-মনে। তিনটি দিন পরে যে সুমনা আবার ফিরে চলল তার ফেলে আসা একলা ঘরে, মনে সে তেমনই নিঃসঙ্গ, কেবল সে এখন বলতে পারে, "মুক্তি চাইবার অধিকার আমি পেয়েছি। এই তিনটি দিন আমাকে শিক্ষা দিল বিজয়কে দূরে রেখে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন আমার সাধ্যাতীত নয় এবং বিজয় বিশ্বের একমাত্র পুরুষ নয়।" প্রবল আত্মবিশ্বাসে এই একলা মেয়ে এখন বলতে পারে, "ভয় কী? জানি, ব্যথার স্থানে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু সুখ পাবার উপাদান আমার জীবনে শেষ হয়ে যায় নি। আমি ভুলে যেতে পেরেছিলাম, প্রয়োজন হলে আবার পারব। এই জ্ঞানই আমার পরম প্রাপ্তি।" এই সুমনাকে দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথের 'বোঝাপড়া' কবিতার এই পংক্তিগুলি হয়তো মনে পড়ে যেতে পারে একালের কোনো পাঠকের,

যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

প্রণয় প্রার্থনা বা তার সফলতা-নিষ্ফলতা এসব কিচ্ছু নয়, সুদ্ধু একটি শাড়ি অঙ্গে ধারণের যোগ্যতা-অযোগ্যতার ওপর কতখানি নির্ভর করে একটি মানুষের মনের আনন্দ, আরাম, শান্তি? 'শাড়ী' গল্পের মঞ্জুলেখাকে না দেখলে বোঝাই যাবে না এ-প্রশ্নের তাৎপর্য। সুন্দরী মঞ্জুলেখাকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই চোখে পড়বে, বাড়িতে মহিলাদের এক চায়ের আসরের আয়োজন করে বহুক্ষণ ধরেই শাড়ি পছন্দ করছে আর বাতিল করে চলেছে মঞ্জুলেখা, কোনো শাড়ি হয়তো অতিথিরা সবাই দেখে ফেলেছে আগে, কোনোটার বা দিনের বেলার পক্ষে রংটা বড়ো বেশি জমকালো,

হঠাৎই মিলে গেল বহুদিন না পরা গাঢ় বেগুনী এক জরিদার বেনারসী, কেবল মিলেই গেল না, মনে পড়তে লাগল তার, এ শাড়ি পরে আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার সেই প্রথম দিনটির আনন্দময় স্মৃতি। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে শাড়িখানি পরে ফেলে প্রত্যাশিত আনন্দে আজও আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় মঞ্জু, কিন্তু ঝলমল করে ওঠা কোনো নারীর প্রতিচ্ছবি তো ফিরিয়ে দিল না আয়না! নানা পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের পর অবশেষে বোধোদয় হলো মঞ্জুলেখার, শাড়ির কিছু হয়নি, যা হয়েছে, তা তার নিজেরই। তেত্রিশ বছরের মঞ্জুলেখার মধ্যে আজ আর কোথায় মিলবে সেই সপ্তদশী লাবণ্যময়ীর চিহ্ন? 'সেদিন চলে গেছে, সে লোকও চলে গেছে।' একলা ঘরে স্তূপীকৃত শাড়ির মাঝে একলা মঞ্জুলেখার মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলে ফিরতে থাকে, 'আর কিছু হবার নেই। .... এখন কেবল বার্দ্ধক্যের প্রতীক্ষা। একঘেয়ে রুটিনের চক্রান্তে জীবন তাকে বেষ্টন করে ধরেছে, যা হবার হয়ে গেছে। পাবার কিছু নেই, আশার কিছু নেই।'

শিল্প কি তবে একাকিত্ব দূর করে, সঙ্গ দেয় শিল্পীমনকে? 'কোনারকের সূর্যমন্দির' গল্প জুড়ে বেজে চলে কুরুবকীর নৃত্যপর পায়ের ছন্দ, যে কুরুবকীর তিলফুল নাসা, অর্ধচন্দ্র ললাট, নাশপাতির মতো সুডোল মুখ, আকর্ণ বিস্তৃত দুটি চোখ, পদ্মদলের মতো অধরোষ্ঠ, ত্রিকোণ চিবুক, সুগঠিত দেহের বঙ্কিমভঙ্গি; নৃত্যপরা কিশোরীর এমন অনুপম লাবণ্যে মুগ্ধ ভাবী শ্বশুর তাকে মনোনয়ন করেন বিলেতফেরত পুত্রের জন্য, কিন্তু বাঙালি ঘরের স্বভাবমতো নাচের ছন্দটাই মুছে দিতে চান পুত্রবধূর দেহবল্লরী থেকে। বিয়ের আগেই বন্ধ হয়ে যায় কুরুবকীর প্রকাশ্য নাচের অনুষ্ঠান, বিফল প্রত্যাশায় ফিরে যেতে থাকে কুরবকীর অনুগামীরা, ফিরে যান কর্মহীন নৃত্যশিক্ষক, একা একা বেতালা নাচে নিজেকে ব্যস্ত রাখে কুরুবকী, বিলেতফেরত এঞ্জিনিয়ার অংশুমালী নিয়মিত আসে, মুগ্ধ হয় অপরূপা এক তরুণীকে দেখে, কিন্তু শিল্পী কুরুবকীর মনের নাগাল পায় না সে। কোনারকের সূর্যদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন মেয়েটি একদিন হারিয়ে যায় সূর্যমন্দিরেই, বিবাহের বাঁধন তাকে সাত পাকে জড়িয়ে নেওয়ার আগেই, অনেক পাওয়া অনেক চাওয়ার মাঝে চির একা বন্দিনী শিল্পীটির প্রাণ হয়তো হারিয়ে গিয়েই পায় তার প্রার্থিত মুক্তি।

স্বজাতি লেখকদের প্রতি একটু বিদ্রূপই কি ধরা আছে বাণী রায়ের 'বর্ষণ এল মনে?' গল্পে! বাঁশরী পত্রিকায় পাঁচদিনের মধ্যে গল্প দিতে হবে বলে মনে মনে বড়ো বিপন্ন লেখিকা মাধবী বাগচী। কাগজ কলম নিয়ে বসার আগেই বৃষ্টি এল চরাচর জুড়ে, বর্ষার সমারোহে চোখ না রেখে উপায় কি আর? কিন্তু এ কী হয়েছে মাধবীর, বর্ষা উপভোগের সেই সরল সৌন্দর্যময় চোখ দুটি কোথায় হারিয়ে ফেলেছে সে? মেঘের দিকে চেয়ে একবার মাধবী বাগচীর মনে হলো, "থোকা আঙুরের মত শ্যাম-চিক্কণ মেঘ, যেন হাতে করে অধরে চেপে ভালবাসতে সাধ হয়। কি সুন্দর উপমাটি মাথায় এলো!

একে হারানো চলবে না।" বর্ষার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে আবার মনে হল মাধবীর, "হাল্কা নীল আকাশের রং কেমন? ঠিক তার মায়ের আলমারীতে তুলে রাখা কাল চওড়াপাড় প্রাচীন সিমলেশাড়ীর আবেশলাগানো স্বপ্নের দেশের হাল্কা নীলের মত। কিন্তু তা তো লেখা চলে না— মেঘ মায়ের আলমারীর পুরনো সিমলেশাড়ীর রংয়ের। অন্য কোন বিশেষণ চাই লেখার জন্য।" এইবার চমক লাগে মাধবীর, সে কি তবে কেবল বর্ষা দেখছে না, কোনো কিছু সহজভাবে কেবল দেখবার ক্ষমতাটুকুই হারিয়ে ফেলেছে তার চোখ? যা দেখছে, তাকেই প্রতি মুহূর্তে এমন লেখায় অনুবাদ করে নিচ্ছে কেন তবে তার মন? নিজেকে ছাড়া এবার আর কাকে ধিক্কার দেবে মাধবী, "যে সাহিত্যিকদের এতক্ষণ নিন্দা করলে, তুমিও যে তাদেরই দলে। হায় মাধবী বাগচী, তুমি যে পেশাদার লেখক বনে গেছ।"

সাদামাটা এক তরুণী-মনে উঁকি দিয়ে তবে দেখা যেতে পারে এবার, নিঃসঙ্গতার ভিন্ন কোনো উত্তর মেলে কিনা। 'শূন্যের অঙ্ক' গল্পে রান্নাঘরে কর্মব্যস্ত এই গৃহিনীটির সংসারে-আশেপাশে মানুষের অভাব নেই হয়তো, কিন্তু কুটনো কোটার বিরক্তিমাখা হাত দুটি তার ভেবে চলেছে, "থোড় কুটতে হবে লাট্টুর মত প্যাঁচ কষে। মোচার রসে নখ যাবে কালো হয়ে। লাউ আবার কাটতে হচ্ছে যেন তুলি দিয়ে বৃষ্টিধারা আঁকবার দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালনে। ...." কখনো বা ভাবছে, "কুমারী জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত আশার সমাধি হয়ে গেছে সাদা গুঁড়োলিপ্ত ময়দার টিনে আর সূক্ষ্মগ্রীব চিনির কাঁচপাত্রে। জলের টিনগুলো আজ সেতার, এস্রাজ অপেক্ষা বেশী পরিচিত।" ও-গল্পেরই দ্বিতীয় ভাগে দেখা মেলে যার, বি.এ. পাশ সম্পন্ন গৃহের দুহিতা সেই কুমারী অনিন্দিতার জীবনেই বা ওই থোড়-বড়ি-খাড়া ছকের একঘেয়েমির বাইরে আছেটা কী? উপন্যাস পড়া, চুল বাঁধা, কাপড় বদলানো, পান সাজা, সরবত বানানো, সেতার বা এস্রাজে টুংটাং, ... এই-ই তো এক বেকার কুমারী জীবন তার। বেকার জীবনে স্কুলের চাকরির ব্যস্ততা এলে কি মিটবে স্বাধীনতার সাধ? তেমন একটি দিনের দিকেই তাকানো যাক তবে, "অপরাহ্ন শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর বুক কেঁপে উঠছে অনিন্দিতার। নিদ্রাশিথিল নয়নে খাতা দেখা শেষ করতে হবে। আর আগামী কালের পঠনের বিষয়টি পড়ে রাখতে হবে। তারপর সকালে উঠেই ছুটোছুটি— প্রাত্যহিক চিৎকার বদ্ধঘরে।" এমনি করে আর দিন কাটতে চায় না কুমারী অনিন্দিতা মৈত্রের, খাতা দেখা থেকে মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে ভাবে, 'দলিত পুষ্পের ব্যর্থতায় জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

তিন পর্বে জীবনজোড়া এ শূন্যের অঙ্ক কিন্তু একটি মেয়েরই গাণিতিক সিদ্ধির ফসল; "... তিনটি চিত্রই অনিন্দিতার। মধ্যের চিত্র অনিন্দিতা যা ছিল, শেষের চিত্রখানি অনিন্দিতা যা হতে পারে বলে ভয় পাচ্ছিল। প্রথম চিত্রটি, ভয় পেয়ে অনিন্দিতা বর্তমানে যা হয়েছে।" বেকার কুমারী, কর্মরতা কুমারী শিক্ষয়িত্রী, বা ঘরণী গৃহিনী—

জীবনের কোনো পর্বেই থোড়-বড়ি-খাড়ার সেই একঘেয়েমি আর নিঃসঙ্গতার দহন ছেড়ে গেছে কি অনিন্দিতাকে? যায়নি যে, সে বোধহয় অনিন্দিতার একটু ভুলের কারণেই, যে ভুলের কথা গল্পের শেষে লিখেছিলেন বাণী রায়; লিখেছিলেন, অনিন্দিতা ভুলে গিয়েছিল 'কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে তার বৃদ্ধি হ্রাস হয় না। জীবনের ক্ষেত্রেও তাই বলা চলে।'

কিন্তু, কেন মেয়েদের জীবনে সব অঙ্ক এমন শূন্যেরই অঙ্ক? আরো দাবি নেই বাণী রায়ের মেয়েদের কাছে? 'নির্বাপিত' নামের গল্পে সেই দাবিই জ্বলে উঠেছিল তাঁর আগুন আর আক্ষেপের ভাষায়, ''মেয়েরা জীবনে একবার জ্বলে ওঠে, সে প্রেমে-দেশের প্রতি অথবা আদর্শের প্রতি প্রেমে। সেই আগুন তারা জ্বালিয়ে রাখতে পারে না। শত তুচ্ছ প্রচেষ্টায় সেই অনল ক্ষয় হয়ে হয়ে নির্বাপিত হয়ে যায়। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে, ... সমষ্টিগতভাবে তোমরা দিলে কি? পুরুষ নির্মাণ করল স্বাধীনতার দুর্গ, তোমরা ইঁট-মাল-মশলা হাতে হাতে যুগিয়ে দিলে মাত্র। মজুরের কাজ থেকে তোমরা কেউ কেউ অবশ্যই রাজমিস্ত্রীর পদে উন্নীত হয়েছ। কিন্তু ওই শেষ। সেও পুরুষের চলা পথে, তারই নির্দেশে। স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন ভারতে তোমাদের নিজস্ব অবদান কোথায়?''

৪

আরো দাবি আছে বাণী রায়ের, দাবি আছে তাঁর পাঠকের কাছেও, এটুকু জেনে নিয়েই বাণী রায়ের পাঠককে তাঁর কাছাকাছি আসতে হয় যে, একটি বুদ্ধিমতী মেয়ের মননদীপ্ত মুখের সামনে দাঁড়াতে চলেছে সে; জানতে হয় তাকে, বাণী রায়ের উপন্যাস বা ছোটোগল্প হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যাবে না দুপুরবেলার নিশ্চিন্ত বিশ্রামের অবসরে; বাণী রায়কে চিনতে হলে, তাঁর লেখিকামনের কাছাকাছি আসতে হলে আর একটু ধার বাড়াতে হবে নিজের মননের, পরিসর বাড়াতে হবে চেনা গণ্ডির পড়াশুনোর। নইলে, অবিরল সাফো, কোলোটিনাস, লুক্রেশিয়া, সেক্টাস, ফ্রিডা, সালোমে, নার্সিসাস-দের উপস্থিতি প্রতিহত করবে তার স্বচ্ছন্দ পাঠের আরাম। এই আরাম কথাটাই একটু অন্যরকম বাণী রায়ের অনুরাগী পাঠকের ক্ষেত্রে, কেবল ইমোশনাল আবেগের ঝড়ও অনুপস্থিত নয় তাঁর কলমে, কখনো কখনো খুব তীব্র গভীর উন্মাদনাতেই তাঁর কলমে বাজে আবেগের রাগিণী, কিন্তু সে-আবেগ কখনো ছাপিয়ে ওঠে না বুদ্ধিকে। শরীর আর শরীর ঘিরে সচেতনতার বোধকেও এমন প্রত্যক্ষভাবে বাণী রায়ের মতো তাঁর কালের আর কোনো নারী লেখকের কলমই তুলে ধরেনি হয়তো, তবু সেই শরীরী আবেগের ধারে ধারেও খেলা করে যায় মনের, মননের ঢেউ। হৃদয় আর মস্তিষ্ক, ইমোশন আর ইনটেলেক্ট, আবেগ আর মনন — দু'হাত বাড়িয়ে মাটি আর আকাশের দুই প্রান্তকে সব সময়েই স্পর্শ করে রাখেন বাণী রায়।

বাণী রায়ের সমকাল থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আজ আমরা, অবহেলায় অনাদরে হারিয়েও ফেলেছি তাঁর উত্তরাধিকারের অনেকখানি ঋদ্ধি, তবু, স্বাধীনচেতা একলা যে-সব মুখ উঁকি দিয়ে যায় তাঁর পড়া-না-পড়া ছোটোগল্পের পাতা থেকে, অপঠিত নির্মনন ঔদাস্যে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো মুখ তারা একটিও নয়। বাণী রায়ের ছোটোগল্পের পাতা উল্টোতে বসলে, কেন জানি না, মনে পড়ে যেতে থাকে স্পেনীয় কবি হিমেনেথের কবিতার এই অনুবাদ-পংক্তিটি, শিকড়ের ডানা হোক, ডানার শিকড় ......, তখনই মনে হয়, বাণী রায়ের কলমের এই ফসলগুলি চিনে নেওয়ার দায় কি সত্যি নেই আজ আমাদের, ঘরের শিকড় ছিঁড়ে একেবারে উড়ে যেতে চায় না যারা, শিকড়ের বুকে কেবল জাগিয়ে রাখতে চায় ডানার উড়াল, আকাশের খোলা হাওয়ার স্বাদ? তখনই মনে হয়, বিস্মৃতির অতল থেকে বাণী রায়ের দীপ্র এই মুখ খুঁজে নেওয়ার দায়বদ্ধতা তো এখন তাঁর উত্তরপ্রজন্মেরই, ধুলোমাখা খাতার পাতা থেকে তাদেরই তো চিনে নিতে হবে অনন্যসহায় এই কথাসাহিত্যিকের ব্যতিক্রমী কলম; আর যদি তা সম্ভব হয়, তবে, সে-জগতে পৌঁছবার পথ চিনলে আজও তো মেয়েদের ডানা পাবে শিকড়ের দৃঢ়তা আর শিকড় পাবে ডানার মুক্তি। শুধু মেয়েরাই কেন, তাঁকে যথার্থভাবে চিনে নিতে পারলে শিকড় আর ডানার এই সমীকরণ কি সত্য হয়ে উঠবে না তার সমস্ত পাঠকের জন্যই?